ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

বাংলাদেশে নজরুলচর্চার ধারা

মোঃ হারুন-অর-রশীদ*

সারসংক্ষেপ: 'সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বালানোর পূর্বে বিকেলবেলা সলতে পাকানো'-র মত বাংলাদেশে নজরুলচর্চা বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করতে গেলে প্রাক-বাংলাদেশ পর্বে নজরুল সাহিত্যের পঠন-পাঠন-আলোচনা-পর্যালোচনা তথা নজরুলচর্চার প্রাথমিক একটি ধারণা দেয়া অপরিহার্য না হলেও নিতান্ত প্রয়োজনীয় নয়। সত্য কথা বলতে গেলে নজরুলের সমকালেই নজরুলচর্চার একটি পরস্পর বিরোধী ধারাক্রম শুরু হয়। এদের একাংশ বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চা, অন্য কথায়, সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবদান অনুধাবনের চেষ্টা করেন। অন্যাংশ স্বজাতিক অহংবোধে তাড়িত হয়ে— যা মূলত অসূয়াবোধ থেকে তাড়িত হয়ে নজরুল বিরোধীতায় অবতীর্ণ হন। এই শেষোক্ত অংশে আবার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উগ্রপন্থী সাহিত্য-সমালোচকবৃন্দ নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। এ ভাবে সমকালে নজরুল সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক বিপরীতমুখী একটি আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। নজরুল সাহিত্যের সাধারণ পাঠক থেকে বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক পর্যন্ত প্রায় সকলেই বিষয়টা কমবেশি অবহিত। এ কারণে এবং আলোচনার বিষয় যেহেতু বাংলাদেশে নজরুলচর্চার ধারা, সেহেতু অতীত অনুধ্যানের পরিবর্তে আলোচনার স্রোতধারা শিরোনামমুখী করে তোলাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

বাংলাদেশে রীতিসিদ্ধ নজরুলচর্চার সূত্রপাত ড. রফিকুল ইসলাম (জ. ১৯৩৪)-এর হাত ধরে। তিনি বাংলাদেশে নজরুল গবেষণার অগ্রপথিক; আমি এম.ফিল., পিএই.ডি. পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক নজরুলচর্চার কথা বলছি। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভটির নাম *কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা*। এই অভিসন্দর্ভটি রচনার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করে। ইতঃপূর্বে তিনি রচনা করেন *কাজী নজরুল নির্দেশিকা* (১৯৬৯), *নজরুল জীবনী* (১৯৭২)। পরবর্তীতে তিনি আরো রচনা করেন *কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সৃষ্টি* (১৯৯৭), *নজরুল প্রসঙ্গে* (১৯৯৭), *গীতি সংকলন: কাজী নজরুল ইসলাম (১-৩), Kazi Nazrul Islam A New Anthology (1990), নজরুল সমীক্ষা* (১৯৯২), *নজরুল স্মৃতিচারণ* (১৯৯৫)।

উল্লিখিত তালিকা থেকে নজরুলচর্চায় ড. রফিকুল ইসলামের নিরন্তর নজরুল ভাবনার পরিচয় প্রজ্বল হয়ে ওঠে। পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের পূর্বেই নজরুল বিষেয়ে অন্তত দুটি গ্রন্থ রচনা করে তিনি নজরুল অনুরাগের স্বাক্ষর রেখেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং পরবর্তী গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাঁর নজরুল সাহিত্য প্রীতির গভীরতা ও ব্যাপ্তি আরো নিবিড় রূপ লাভ করেছে। ড. রফিকুল ইসলামের পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক কে ছিলেন, আমার তা জানা নেই; কিন্তু পরীক্ষক প্যানেলের একজন পরীক্ষক ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ও বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান। আবার কাকতালীয়ভাবে হলেও ড. আবদুল মান্নান ছিলেন একজন স্নেহধন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ড. রফিকুল ইসলামের পি-এইচ.ডি থিসিসের গুণগতমানের প্রশংসা প্রসঙ্গে ব্যক্তি অভিমতের সঙ্গে বলতেন,

*অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

অভিসন্দর্ভটি আরো খানিকটা নিবিড় ও সংহত হলে ভাল হত। তাঁর অভিসন্দর্ভটি পড়ে আমারও মনে হয়েছে সম্ভবত ড. মান্নানের অভিমত অযথার্থ নয়। তবে একথা সত্য, প্রথাসিদ্ধ নজরুল গবেষণাকর্মের তিনি শুধু পথিকৃতই নন— প্রকৃত নজরুল অনুরাগী ব্যক্তি এবং তাঁর সে প্রীতিময় অনুরাগ তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের নজরুল ভক্তবৃন্দের মাঝে। নজরুলচর্চা ও গবেষণায় এটিই তাঁর বড় কৃতিত্ব ও অবদান। নজরুলচর্চায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তিনি ১. নজরুল একাডেমি পুরস্কার, চুরুলিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ, ২. বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ৩. নজরুল ইনস্টিটিউট সাহিত্য পুরস্কার (ঢাকা) লাভ করেন।

বাংলাদেশে নজরুল বিষয়ে পি-এইচ.ডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ড. কামরুল আহসান (জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯৪১)। তাঁর অভিসন্দর্ভের নাম *নজরুল কাব্যে সাময়িকতা*। এ অভিসন্দর্ভের জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তাঁর প্রকাশিত নজরুল বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে: *নজরুল সাহিত্য পাঠের ভূমিকা* (প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ: ১৩৮৩); ২. *ছোটদের নজরুল*, ৩. *নজরুল চর্চা ও গবেষণা* (১৯৯৮), ৪. *রবীন্দ্র-নজরুল ভাবনা* (বই মেলা ২০০০), ৫. *নানা ভাবনার নজরুল* (২০০৮)।

একমাত্র *নজরুল সাহিত্য পাঠের ভূমিকা* ব্যতীত তাঁর অন্য সকল রচনা বিশুদ্ধ নজরুলচর্চার নমুনা। তাঁর থিসিসটি আমার সংগ্রহে নেই। কিন্তু নামকরণ অনুধাবন করলেই অনুমান করা সম্ভব ও সঙ্গত যে, নজরুল কাব্যে উদ্ভাসিত সাময়িকতা কালের গরজ ও কালের তাগিদ গ্রন্থটিতে কথা কয়ে উঠেছে। উদ্ভাসিত হয়েছে কালগত উপযোগিতা ও প্রাতস্বিকতা। অন্তত তাঁর অন্যসকল গ্রন্থে তাঁর সিরিয়াসনেস দেখে— এমনটা মনে হওয়াই সঙ্গত। তিনি যে একজন সজ্জন, সত্যভাষী এবং সত্যান্বেষী ব্যক্তি— তা তাঁর শেষোক্ত তিনটি বইয়ে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এ বাংলা ও বাংলায় নজরুলচর্চায় যে অমনোযোগিতা, অবহেলা, নজরুলের নামে সস্তা গালগল্প ও অসত্য তথ্য নজরুলের সত্য সত্তাকে ক্রমশ ধোয়াশাচ্ছন্ন করে তোলার প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে— তাতে তিনি একাধারে ব্যথিত, শঙ্কিত এবং শঙ্কা মোচনে নিরাবেগ নিরাসক্ত গবেষণায় নিরন্তর নিবেদিত। তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ও অভিনন্দনযোগ্য। বিশেষ করে নজরুলচর্চার নামে যে নৈরাজ্য চলছে তা তিনি স্বদৃষ্টান্ত সাবলীল বিশ্লেষণে নজরুলচর্চা ও নজরুল গবেষণায় বর্তমানে রত ও ভবিষ্যতে নিমগ্ন হতে ইচ্ছুক–এমন ব্যক্তিদের প্রতি সতর্ক সংকেতে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এ উদ্যোগ নজরুলচর্চায় আগ্রহী গবেষকদের বিভ্রান্তির চোরাবালি থেকে উদ্ধার করবে— এ আশা করা যায়।

ডিগ্রি প্রাপ্ত তৃতীয় নজরুল গবেষক হচ্ছেন ড. করুণাময় গোস্বামী (জ. ১১ মার্চ ১৯৪৩)। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান* গ্রন্থটির জন্য পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এ গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অভিসন্দর্ভ রচনার পূর্বে *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ* শীর্ষক তাঁর একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থ (১৯৭৮) প্রকাশিত হয়। তাঁর নজরুল বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে: *Aspects of Nazrul songs* (1990), *Kazi Nazrul Islam: A Biography* (1990);

নজরুলের শিশুতোষ কবিতা (১৯৯৫); *নির্বাচিত নজরুল শিশুসাহিত্য* (১৯৯৫), *নজরুল সংগীতের তালিকা* (১৯৯৫)। ড. করুণাময় গোস্বামী নজরুল গবেষণার জন্য নজরুল ইনস্টিটিউট প্রদত্ত নজরুল স্মৃতি পুরস্কার ও স্বর্ণপদক লাভ করেন ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে।

অবস্থানগত দিক থেকে নজরুল গবেষক হিসেবে আমার (ড. মোঃ হারুন-অর-রশীদ) [জ. ১৯৫২]) স্থান চতুর্থ। আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম *নজরুল সাহিত্যে ধর্ম*। আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, বিরল ও অনন্য বাগ্মী প্রফেসর ড. কাজী আবদুল মান্নান। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে উপর্যুক্ত অভিসন্দর্ভটির জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে পি-এইচ.ডি ডিগ্রিতে ভূষিত করেন। নজরুল সাহিত্যে আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, সমকালের নজরুল ইসলাম স্বসমাজে এক শ্রেণীর ধর্মবাদী সমালোচকের কোপানলে পড়েছিলেন। তাঁকে কাফের, মুরতাদ, শয়তান, ইবলিশ ইত্যাকার প্রায় যাবতীয় অভিযোগে ধর্মদ্রোহী ও ভ্রান্ত পথচারী পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে অভিহিত করে নানা ভাবে তাঁর উপর দোষারোপ করেছেন। ধর্ম বলতে নজরুল বুঝতেন মানসিক পরিশুদ্ধতা, মানবতা ও সর্বজনীন শ্রেয়োবোধ-কল্যাণকামিতা এবং সৃষ্টির প্রতি গভীর অনুরাগ। শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠাকিতাকে নজরুল কখনই ধর্ম মনে করতেন না। প্রসঙ্গত *বাঁধনহারা* উপন্যাসের সাহসিকার পত্র থেকে উদ্ধৃত করা হলো:

> মন্দিরে গিয়ে পূজা করা আর মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াটাই কি ধর্মের সার সত্য? এ গুলো বাইরের বিধি। কিন্তু এগুলোকেই কি তারা ভাল করে মেনে চলতে পারে? মন্দিরে গিয়ে দেবতার মুখস্থ মন্ত্র আওড়াও, কিন্তু মন থাকে তার লোকের সর্বনাশের দিকে। মসজিদে গিয়ে নামাজের 'নিয়ত' করেই ভাবে যত সব সংসারের পাপ দুশ্চিন্তা। এই ভণ্ডামি এই প্রতারণাইতো এদের সত্য। ...একজন সত্যান্বেষী বিদ্রোহীকে তাড়া করবার মতো এ মিথ্যুক ভণ্ডদের যে বিলকুল নাস্তি।...সত্যকে স্বীকার করবার মতো সাহসই যদি থাকবে, তবে এদের এমন দুর্দশাই না হবে কেন? মনসুর যখন বিশ্বের ভণ্ডমিথ্যুকদের মাথায় পা রেখে বলে ছিল, "আনাল হক"— আমিই সত্য-সোহম, তখন যে সব বক ধার্মিক তাঁকে মারবার জন্য হৈ হৈ রৈ রৈ করে ছুটে ছিল, এ লোকগুলো যে তাঁহাদেরই বংশধর। এ মিথ্যা ধার্মিকের দলইতো সেদিনে ঐ মহর্ষি মনসুরের কথা, তাঁর সত্য বুঝতে পারেনি, আজও পারছে না, আর পারবে না, এদের এরকম একটা দলই থাকবেই।[১]

একই পত্রে সাহসিকার আরও দৃঢ় সাহসী উচ্চারণ:

> গোঁড়া ধার্মিকদের ভুল তো ঐখানেই। ধর্মের আদত সত্যটা না ধরে এঁরা ধরে আছেন যতসব নৈমিত্তিক বিধি-বিধান। এঁরা নিজের ধর্মের উপর এমনি অন্ধ অনুরক্ত যে, কেউ এতটুকু নাড়াচাড়া করতে গেলে ফোঁস করে ছোবল মারতে ছোটেন। কিন্তু এটুকু বোঝেন না তাঁরা যে, তাঁদের 'ঈমান' বা বিশ্বাস, তাঁদের ধর্ম কত ছোট, কত নীচ, কত হীন যে, তা একটা সামান্য লোকের এতটুকু আঁচড়ের ঘা সইতে পারে না। ধর্ম কি কাঁচের ঠুনকো গ্লাস যে একটুতেই ভেঙ্গে যাবে?[২]

মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা নজরুলের শিল্পী-সত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কলাকৈবল্যবাদ নয়, কল্যাণবাদের বিশ্বাস তাঁর। ধর্মের ক্ষেত্রেও। ধর্মের ইহ-জাগতিক কল্যাণকর দিক, পারলৌকিক মুক্তির চেয়ে নজরুলের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করে। ধার্মিক হওয়ার চেয়ে

মানবিক হওয়ার দিকেই ঝোঁক বেশি তাঁর। হিন্দু-মুসলমানের চেয়ে মানুষ বড়। সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে স্বাদেশিকতা। *কুহেলিকা* উপন্যাসের জাহাঙ্গীর তাই হিন্দু নেতৃত্ব প্রদান বিল্পবীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বিপ্লবী হয়ে উঠলে অনিমেষ বলে,

> প্রমত-দা, জাহাঙ্গীরকে আমাদের দলে নেওয়ায় অন্তত আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভেবে দেখিনি। তাকে আমি দেখেছি মানুষ হিসাবে। সে হিসাবে সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়। কিন্তু এ নিয়ে শেষে আমাদের মধ্যে একটা মতান্তর না বাধে। আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামিকে আজও পেরিয়ে যেতে পারে নি— ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি।[৩]

অনেক ধার্মিক ব্যক্তিই গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। ভুলতে পারেন না অনেকে নেড়ে, যবন, মালাউনের অনেক টিকি-দাড়ির-বৈষম্য। বরং এগুলোই তাঁদের তাপস সাজার নানান উপাদান। কিন্তু নজরুল পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন, যাঁরা বলেন, "আমরা ডানহাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গী এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে।"[৪] "ওরা হিন্দু নয়, মুসলমান ও নয়, গুণ্ডা।" কিংবা বলা যায় অহিফেন সেবী মাতাল। ধর্ম মাতাল। এ সম্পর্কে প্রমত-দার কণ্ঠে নজরুলের উক্তি,

> দেখ, এই বাংলাদেশে গাঁজার চাষ করে গভর্মেন্ট তত সুবিধে করতে পারে নি, যত সুবিধে তাদের করে দিয়েছে আমাদের মহাপুরুষেরা আমাদের মস্তিস্কে ধর্মের চাষ করে, আমাদের দাঁতের গোড়া ভাঙবার জন্যে ইংরেজের শিল নোড়া হয়ে উঠেছে আমাদের ধর্ম। ইংরেজের ভারত শাসনের ষড়যন্ত্র কি জানিস? আমাদের পরস্পরের প্রতি এই অবিশ্বাস, পরস্পরের ধর্মে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা"।[৫]

বলাবাহুল্য, নজরুল সারাজীবন ধরে তাঁর সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি এই 'আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা' দূর করবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াসে কলম চালিয়েছেন। এদিক থেকে নজরুল বাংলা সাহিত্যে একটি বিরল দৃষ্টান্ত। ব্যতিক্রমী প্রতিভা। তাঁর ধর্ম যেমন মানব ধর্ম, ভারতবর্ষও তেমনি মানুষের ভারতবর্ষ। তাঁর নিজের কথায়, "আমার ভারতবর্ষ ভারতের এই মূক-দরিদ্র-নিরন্ন-পর পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্তান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়, আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ। এ ভারতবর্ষ...মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষও নয়— এ আমার মানুষের— মহামানুষের মহাভারত।"[৬]

সঙ্গত কারণেই অন্নদাশঙ্কর রায় মন্তব্য করেছেন:

> ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
> আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
> ভাগ হয়নিকো নজরুল।
> এই ভুলটুকু বেঁচে থাক,
> বাঙালি বলতে একজন আছে
> দুর্গতি তার ঘুঁচে যাক।

কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, অন্নদাশঙ্কর প্রত্যাশিত নজরুলের দুর্গতি ঘুঁচে যায় নি। বরং ভারত বিভাজনের পর এবং তারও পর পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ জন্ম লাভ করলেও নজরুলের বিপত্তি কমে নি; বেড়েছে বরং বহুলাংশে। যে কবি ভারত বিভাজনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন; ছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টির বিপক্ষে এবং পাকিস্তানকে ব্যঙ্গভরে অভিহিত করতেন "ফাকিস্থান" বলে— ভারত বিভাগের পর তাঁর রচনাবলীকে পাকিস্তানি আদর্শে পরিমার্জন করার অপপ্রয়াসেও ঐ ধর্মবাদীদল, বৃত্তায়িত চিন্তার অধিকারী, অধুনা, যাদের জনপ্রিয়ভাবে মৌলবাদী বলে শনাক্ত করা হয়— তাঁর আজও প্রাণান্তকর প্রয়াসে নজরুলকে মুসলমান বানানোর প্রচেষ্টায় রত। নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান ও সরকারী ঘোষণায় তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের পর নজরুল কাব্যের মূল ব্যঞ্জনা অসাম্প্রদায়িকতা ও সর্বজনীন মানবতাবাদ থেকে সরে এসে কবিকে এখন ইসলামী কবি বলা হচ্ছে। অন্তত মুক্তবুদ্ধিচর্চাশীল সাহিত্য সমালোচকবৃন্দ ব্যতীত তথাকথিত ধর্মবাদী একটি গোষ্ঠী এ চেষ্টায় নিরন্তর নিমগ্ন থাকছেন। তাঁর খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামী চিন্তা বা অনুষঙ্গমূলক দৃষ্টান্তসমূহ নজরুল রচনাবলী থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে সংকলিত করছেন এবং নজরুলকে মুসলিম কবি বলে জোরে সোরে প্রচার করে যাচ্ছেন। কবি-সাহিত্যিক শিল্পীদের একটি পারিবারিক ধর্ম থাকলেও তাদের সৃজিত শিল্পকর্মসমূহ যে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র সম্প্রদায় বহির্ভূত, পৃথিবীর সকল মানুষের এজমালি সম্পত্তি— একথা বেমালুম ভুলে যান ধর্ম ঘাঘু ব্যক্তিবর্গ কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবেই ধর্মের দেয়াল তুলে শিল্প সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক আলখেল্লা পরান। যেমন করা হচ্ছে নজরুলের ক্ষেত্রে। ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত নজরুল বিষয়ক অনেক গ্রন্থেই বিস্ময়ের সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছি। ভাবটা যেন এমন, হিন্দুদের উদ্দেশ্য করে বলা, 'তোমাদের যদি রবীন্দ্রনাথ থাকে, তো আমাদেরও আছে নজরুল।' অর্থাৎ ভাগ হয়ে গেছে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ দুই কবি–রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুদের; কাজী নজরুল ইসলাম মুসলমানদের। কুষ্টিয়ার আমলা কলেজে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আমি ছিলাম প্রধান অতিথি। সেখানে আমার বক্তব্য পরিবেশন শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে একজন প্রবীণ হাইস্কুলের হেডমাস্টার, দর্শক-শ্রোতার সারির মধ্য থেকে দাঁড়িয়ে আকস্মিকভাবে পর পর কয়েকটি প্রশ্ন করেন আমাকে। যা শুনে একবারে থ। প্রশ্নগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছিল এমন:

১. আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে বড় কবি?
২. আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, রবীন্দ্রনাথ নয়, নজরুল ইসলামই বিশ্বকবি উপাধি পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন?
৩. আপনি কি মনে করেন না যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ চক্রান্ত না করলে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে কাজী নজরুল ইসলামই পেতেন নোবেল প্রাইজ?
৪. এবং আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাতনী আশালতা সেনগুপ্তাকে নজরুলের পিছনে লাগিয়ে এবং ছল ভালবাসায় বশীভূত করে নজরুল প্রতিভা বিকাশের সর্বনাশা অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলেন?

আমার উত্তর ছিল এরকম, দুটি প্রতিভার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে তুলনামূলক আলোচনা করে কে বড়, কে ছোটো তা নির্ণয় করার চেষ্টা যথার্থ নয়। কেন না, যে যে কাব্যেবৈশিষ্ট্যের জন্য একজন কবি বা শিল্পী খ্যাতিমান হতে পারেন, ঠিক তার বিপরীত কাব্যবৈশিষ্ট্যের জন্য অন্যজন হতে পারেন প্রিয় ও পাঠকনন্দিত। একইভাবে প্রবীণ ঐ স্কুল শিক্ষকের নিকট তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের সূত্রে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন সালে নোবেল পুরস্কার পান, নজরুলের জন্ম কোন সালে এবং রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সময়কালে নজরুলের বয়স কত ছিল এবং নজরুলের সাহিত্যচর্চা সে সময় আদৌ শুরু হয়েছিল কিনা। হয়ে থাকলে সে সময় তাঁর কী কী রচনা প্রকাশের আলোয় আত্মপ্রকাশ করেছিল?

বলাবাহুল্য যে, ভদ্রলোকের উত্তরের মধ্যদিয়ে অভিযোগগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। এ থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, নজরুল সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের প্রত্যাশা নিরাশার বালুচরে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে ভূত হয়ে গেছে একেবারে। এবং বাংলাদেশের নজরুলচর্চা বহুলাংশে নজরুল সাহিত্যের মূলীভূত সত্য থেকে অপসৃয়মান। প্রসঙ্গত, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁকে লেখা নজরুলের নিজস্ব উক্তি স্মরণ করা যায়:

> আপনার মুসলিম–সাহিত্য কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিক কথা তুলবেন হয়ত। ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুসলিম ভাবাপন্ন সাহিত্য? যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার বাইরের একটা ধর্ম থাকবে নিশ্চয়। ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোন ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি: গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ। ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি ত স্বীকার করিই, যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য কেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে।[৭]

এ কারণেই আমি আমার গবেষণায় শাস্ত্রের আপ্তবাক্য নয়, আন্তরসত্য তথা নজরুল সাহিত্যে ধর্ম কী ভাবে, কোন ব্যঞ্জনায় ও তাৎপর্যে শিল্পায়িত হয়ে উঠেছে তা অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। আমার বিবেচনায় নজরুল সাহিত্যে প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম নয়, বরং মানবধর্মের মাহাত্ম্য নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। বৃত্তায়িত চিন্তার পরিবর্তে মুক্তচিন্তার ব্যাপক চর্চায় নজরুল সাহিত্য সমৃদ্ধ এবং অসাম্প্রদায়িক উদার নৈতিক ভাবনায় ঋদ্ধ। অতএব:

> যারা ভেঙে চলে অপদেবতার মন্দির আস্তানা
> বকধার্মিক নীতিবৃদ্ধের সনাতন তাড়িখানা।

নজরুল তাঁদের কবি। নজরুল কবি তাঁদের, যাঁরা অকম্পিত কণ্ঠে নজরুলের মতো বলতে পারেন:

> কাটিয়া উঠেছি ধর্ম আফিম নেশা
> ধ্বংস করেছি ধর্ম যাজকি পেশা
> কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা?

অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে নজরুল বলেছেন, "ওরা সব পড়ছে কেতাব/নিচ্ছে খেতাব/ নিমক হারাম বেঈমান।"— তাদের মতো না হয়ে মানুষের মতো মানুষ, সত্য প্রীতিময় মানুষ খুঁজছেন কবি জীবনভর কাব্য সাধনায়; সাহিত্যচর্চায়। নজরুলচর্চার ক্ষেত্রে এটাই হওয়া উচিত গবেষকের অন্বিষ্ট। এবং প্রি-কনসিভ আইডিয়া সর্বতোভাবেই পরিত্যাজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথচ বর্তমান নজরুলচর্চায় গতানুগতিকতার গড্ডল স্রোতে গা ভাসানোর প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠছে দিন দিন। ফলে সমগ্রতাস্পর্শী না হয়ে তা হয়ে পড়েছে বড় বেশি একপেশে। মনে রাখতে হবে, 'যে দেখে সমগ্র রূপে/ এ বিশ্বে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।'— রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি গবেষণা বা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আপ্তবাক্যের মতো সত্য।

পি-এইচ.ডি প্রাপ্ত পঞ্চম নজরুল গবেষক সম্ভবত ড. আলী হোসেন চৌধুরী। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল *নজরুলের সাহিত্যকর্মে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতির প্রভাব।* এ গবেষণা-কর্মটির জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া তাঁকে ২০০৫ সালে পি-এইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করে। উল্লিখিত অভিসন্দর্ভটির পরীক্ষক প্যানেলের আমি ছিলাম সভাপতি। নজরুল সাহিত্যকর্মে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতির প্রভাব কীভাবে কবিকে সৃজনী প্রেরণায় উদ্বেলিত করেছে তা অনুপুঙ্খ উদঘাটনই— এ অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয়। গবেষক পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর অভীষ্ট লক্ষে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর উপাত্ত সংগ্রহ প্রশংসনীয়। কিন্তু অনেক উপাত্তের প্রত্যাশিত ও যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যনির্দেশ অনুপস্থিত। ব্যাখ্যা দুর্বল। ভাষাও প্রবন্ধ উপযোগী ও বলিষ্ঠ নয়। আবার অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম থেকে 'সাহিত্যকর্ম' শব্দবন্ধটির পরিবর্তে *নজরুল সাহিত্যে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতির প্রভাব* করলে একদিকে যেমন শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি পেত, অন্যদিকে তেমনি বাড়তি 'কর্ম' শব্দটি অনায়াসে ঝেড়ে ফেলা যেতো। তবে একথাও সম্ভবত মিথ্যা নয় যে, একজন লেখক, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী-কবির যদি কোনো প্রথাসিদ্ধ গবেষণা গ্রন্থ থেকে থাকে, তো নিঃসন্দেহে তাঁর রচিত অভিসন্দর্ভটি দুর্বলতম হবে। কেন না গবেষণা-কর্মে, বিশেষ করে পিএইচ.ডি, এম.ফিল কিংবা ডি.লিট— তা যে পর্যায়েরই হোক, লেখকের স্বাধীন ইচ্ছার সেখানে কোন মূল থাকে না। থাকে না তাঁর প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত নির্ভরতা ব্যতীত নতুন কিছু বলা বা স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবুও পিএইচ.ডি, এম.ফিল, ডি.লিট পর্যায়ের ডিগ্রি প্রাপ্ত গবেষণা-কর্মের মূল্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক। সম্মানজনক উভয় দিক থেকেই— যাঁর শিল্পকর্মের উপর অভিসন্দর্ভ রচিত হয় তাঁর এবং যিনি রচনা করেন তাঁরও।

আমার জানামতে, পি-এইচ.ডি প্রাপ্ত ষষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন ড. মোঃ সাইদুল হক (শিমুল মাহমুদ)। তাঁর গবেষণা শিরোনাম *নজরুল কাব্যে পুরাণ প্রসঙ্গ*। এ গবেষণা-কর্মটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রফেসর সফিকুন্নবী সামাদী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ড. শিমুল মাহমুদকে পি-এইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করে। অভিসন্দর্ভটিতে নজরুল কাব্যে পুরাণ ব্যবহারের নানা কৌণিক ও বৈদগ্ধ দিক উন্মোচিত হয়েছে। বিশ্লেষিত হয়েছে এ সম্পর্কে নজরুল প্রতিভার ক্ষুরধার বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত ছয়টি গবেষণা অভিসন্দর্ভ ব্যতীত আর কোন রীতিসিদ্ধ গবেষণা হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। এমন কি, বাংলা একাডেমি, নজরুল

একাডেমি ও নজরুল ইনস্টিটিউট এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যান দিতে পারে নি। অতএব, আমার আলোচনার বাইরে ডিগ্রি প্রাপ্ত নজরুল গবেষক থেকে থাকলে, সম্ভবত থাকা সম্ভব— তাঁদের প্রতি রইলো আমার অনিঃশেষ শ্রদ্ধা। অপরিসীম সম্মান ও অপরিমেয় ভালবাসা।

এবার গবেষণাধর্মী ও নজরুল সাহিত্য কর্মের উপর রচিত কিছু উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়। এ পর্যায়ে বহুল পঠিত ও আলোচিত-সমালোচিত লেখকদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করছি সুফী জুলফিকার হায়দারের নাম। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর *নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়*। এটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সনে। ১৯৬৯ সনে মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহর *নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা*' এর পূর্বে খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনের *যুগস্রষ্টা নজরুল*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৯৬৮ সনে। *যুগস্রষ্টা নজরুল* শুধু সুখপাঠ্য বই নয়, পাঠকনন্দিতও। নজরুল কাব্যের আরেকটি পাঠকনন্দিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ কবি আতাউর রহমানের *নজরুল কাব্য সমীক্ষা*। এটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রাজিয়া সুলতানার *কথাশিল্পী নজরুল*। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় আবদুল মান্নান সৈয়দের *নজরুল ইসলাম: কবি ও কবিতা*। ড. মজিরউদ্দীন মিয়ার *নজরুলের গদ্যসমীক্ষার* প্রকাশকাল ১৯৭৮। আবদুল মান্নান সৈয়দের আর একটি উল্লেখযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ নজরুল সমালোচনার গ্রন্থ *নজরুল ইসলাম: কালজ-কালোত্তর*'র প্রকাশকাল ১৯৮৭। শেখ দরবার আলমের *অজানা নজরুল* প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৮০-তে প্রকাশিত হয় শেখ আব্দুল হাকিমের *নজরুল সাহিত্যে মানবতা ও ধর্ম* এবং মোবাশ্বের আলী রচনা করেন *নজরুল প্রতিভা* (১৯৮১)। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মুস্তফা নূরউল ইসলামের বিখ্যাত গ্রন্থ *সমকালে নজরুল ইসলাম*। নজরুলের সমকালে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুল বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ *সমকালে নজরুল ইসলাম*। নজরুলের সমকালে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুল বিষয়ক পরস্পর বিরোধী আলোচনা-সমালোচনা ও নানা অনুষঙ্গভিত্তিক আকরগ্রন্থ এটি। নজরুল বিষয়ক লেখালেখির ক্ষেত্রে *সমকালে নজরুল ইসলাম* গ্রন্থের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। যেমন সর্বজনস্বীকৃত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ কমরেড মুজাফফর আহমদের *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা* (প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ ১৯৭৩)। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় আবদুস সাত্তারের *নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ*' কবি আতাউর রহমানের নজরুল *উপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবির* প্রকাশকাল ১৯৯৩। বিশ্বজিৎ ঘোষের 'নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রবন্ধ'ও ১৯৯৩-এ প্রকাশিত। শাহাবুদ্দীনের *নজরুল সাহিত্য বিচার* প্রকাশিত হয় ১৯৭৬-এ। তাঁর *নজরুল ইসলাম ও ইসলাম*-এর প্রকাশকাল ১৯৮০ এবং *নজরুল সাহিত্যে দর্শন* (১৯৮৩)। ভূঁইয়া ইকবালের *নজরুল কবিতা: বাজেয়াপ্তির জন্য অনুবাদ* প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ তে। সেলিম জাহাঙ্গীরের *লোকায়ত নজরুল* (১৯৯৭)। জামরুল হাসান বেগের *নজরুল ইসলাম এবং অন্যেরা*-র প্রকাশকাল ১৯৮৮। ড. সফিকুন্নবী সামাদীর *নজরুলের গান: কবিতার স্বাদ*–প্রকাশিত হয় ২০০১-এ। মাসুমা খানমের *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব*-এর প্রকাশকালও ২০০১। বর্তমান প্রবন্ধকারের রচিত *চিরঞ্জীব নজরুল* প্রকাশিত হয় এপ্রিল ২০০০ খ্রিস্টাব্দে এবং *শিল্পিত নজরুল অন্বেষিত অপচয়* প্রকাশিত হয় ২০০৪-এ। মীর আবুল

হোসেন সম্পাদিত, *তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ* (১৩৮০ বঙ্গাব্দ) এটি একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ নজরুল সমালোচনা গ্রন্থ। নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি কর্তৃপক্ষ *কাণ্ডারী হুঁশিয়ার* শীর্ষক নজরুল জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছে ২৫ মে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে। এ গ্রন্থের উপদেষ্টা সম্পাদক বাংলা কাব্যের একজন শক্তিমান কবি আল মাহমুদ। আল মাহমুদ এর কবি প্রতিভার প্রখরতা ও নান্দনিক দক্ষতা সম্পর্কে কেউ-ই হয়ত প্রশ্ন তুলবেন না। উল্লিখিত গ্রন্থের তিনি উপদেষ্টা সম্পাদক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি বলে অভিহিত কমিটির অন্যান্য সদস্য, একমাত্র শাহাবুদ্দীন ব্যতীত, না জাতীয়ভাবে পরিচিত নজরুল গবেষক, বিশেষজ্ঞ বা বহুল পরিচিত নজরুল বিষয়ক লেখক সমালোচক, না বিশিষ্ট নজরুল ব্যক্তিত্ব। তদুপরি মুক্তবুদ্ধির বৃত্ত থেকে পিছটান দেয়া এবং ধর্মবাদী ডানপন্থীদের কাতারভুক্ত যে আল মাহমুদ বর্তমানে মৌলবাদী চিন্তার ধারক ও বাহক, বিশ্লেষক ও মূল্যায়ক তাঁর সৈনাপত্যে সংকলিত কাণ্ডারী হুঁশিয়ার-এর মধ্যে খ্যাতিমান কিছু সংখ্যক বস্তুনিষ্ঠ নজরুল সমালোচকের লেখা অন্তর্ভুক্ত হলেও কথিত সংকলনটির মূল প্রবণতা নজরুলকে ইসলামী কবি ও ইসলামী চিন্তাবিদের অগ্রপথিক বলে শনাক্ত করার প্রবণতা। যে প্রবণতা সাহিত্য বিচারের নান্দনিক মানদণ্ডের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। উপরে প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর পত্রের উত্তরে নজরুলের পত্র থেকে যে উদ্ধৃত হয়েছে "যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে।" কথাটির অর্থ শুধু মুসলমানের হবে না বরং সর্বজনীন এবং দেশকালাতিরিক্ত সকল মানুষের হবে। অতএব নজরুলের উক্তি মতেই তা মুসলিম সাহিত্য বলে কখনই গণ্য হবে না। অথচ আলোচ্য সংকলনটিতে নজরুল রচিত সর্বশ্রেণীর রচনার নমুনা সংকলিত হয়নি। যেমন প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়— তাঁর 'রক্তজবা', 'দশমহাবিদা', 'হরপ্রিয়া' এবং নজরুলের ব্যাপক শ্যামাসঙ্গীতের কিছুমাত্র নমুনার কোন নজির চোখে পড়ে না এতে। উপরন্তু এ সংকলনের তৃতীয় অধ্যায় বলে চিহ্নিত অধ্যায় ব্রাকেটের মধ্যে সংকলকদের মূল অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয়েছে এ ভাষায় (জাতিসত্তার প্রয়োজনে নজরুল)। এখানে জাতিসত্তা বলতে শুধু মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে তা অনুভব করা যায়— এ অধ্যায়ে মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুষঙ্গ অনুপস্থিত থেকে গেছে। কিন্তু নজরুল যখন 'দেবীস্তুতি' গ্রন্থে হিন্দুদের আরাধ্য আদ্যাশক্তি সম্পর্কে বলেন:

> জীব যখন তাহাকে পিতা, স্বামী, সখা, পুত্ররূপে উপাসনা করে, তখন তিনি পুরুষরূপে দেখা দেন। যখন মাতা বলিয়া, কন্যা বলিয়া ভক্তি করে, তখন তিনি নারীরূপে আবির্ভূতা হন। যে যোগী অরূপের পিয়াসী, তাহাকে তিনি দেখা দেন জ্যোতিঃরূপে, চিন্ময়রূপে। রূপ অরূপে লয় হইতেছে, আবার অরূপ রূপে মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে— ইহাই তাঁহার সৃষ্টি প্রলয়-লীলা। বরফ গলিয়া জল হইতেছে, জল বাষ্পে পরিণত হইতেছে–বাষ্প মেঘ হইয়া বৃষ্টি ধারায় গলিয়া পড়িতেছে, আবার সেই বৃষ্টিধারার জলরাশি বরফে পরিণত হইতেছে। যোগদৃষ্টি সম্পন্ন পূর্ণজ্ঞানীর কাজে যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার।[৮]

তখন কি হবে? যখন নজরুল বলেন, 'কে বলে মোর মাকে কালো/ মা যে আমার জ্যোতির্ময়ী/ কোটি চন্দ্র-সূর্য তারা/ নিত্য করে মা'র আরতি? (রাঙাজবা) অথবা যখন

বলেন, 'বলরে জবা বল/ তুই কোথায় পেলি আমার রাঙা মায়ের চরণ তল' (ঐ) কিংবা যখন বলেন:

দুর্গতি নাশিনী আমার
শ্যামা মায়ের চরণ ধর।
যত বিপদ তরে যাবি
মাকে বারেক স্মরণ কর। (রাঙাজবা)

এ সব প্রশ্নের উত্তর নজরুল জন্মশতবার্ষিকীতে কথিত জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' সংকলন একপেশে; অন্য কথায়, শুধু মুসলিম সম্প্রদায় অনুকূল কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা বা নজরুলের কবি প্রতিভা মূল্যায়নের নামে সমগ্র নজরুলের পরিবর্তে যখন খণ্ড নজরুলকে উপস্থিত করা হয়েছে, তখন তাঁর প্রকৃত সত্তা পাওয়া যাবে না। বরং এক ধরনের স্বেচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি বা ভুল ইনফরমেশন পরিবেশন করে জাতিকে ধোঁয়াশার আবর্তে নিক্ষেপ করা হচ্ছে— যা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। মনে রাখতে হবে নজরুল বাঙালি জাতীয়তাবাদী কবি; অখণ্ড ভারতবর্ষের কবি এবং সমগ্র মানবজাতির কবি। তিনি কখনই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী কবি নন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি; 'নজরুলের সমকালের এক ধরনের শুদ্ধতাবাদী মুসলমান লেখক ও ওলামা-মাশায়েকবৃন্দ নজরুলকে কাফের মুরতাদ, শয়তান ইবলিশ বলে আখ্যায়িত করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, তাঁকে নানাবিধ প্রকারে নির্যাতন ও গঞ্জনা করেছেন। সেদিনে এ সব কর্মকাণ্ডের যাঁরা কওমে লিডার ছিলেন, আজকে তাঁদেরই উত্তরসূরীবৃন্দ নজরুলকে ইসলামি কবি বানানোর সীমাহীন কসরতে সদা তৎপর। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে সেকালের ওলামা-মাশায়েক এবং ভক্ত অনুসারী সমালোচকবৃন্দের নজরুল সমালোচনা ছিল ভুল ও অনৈতিক মানসিক অজাচার। আর যদি তাঁদের সমালোচনা সঠিক ও যথার্থ ছিল বলে মেনে নেয়া হয়, তো আজকের তাঁদের উত্তরসূরী যাঁরা নজরুলকে ইসলামী কবি বলে অভিহিত করে খুশীতে ডগমগ হয়ে ভাবছেন, দ্বীনী দায়িত্ব পালন করা গেল, তাঁরা চূড়ান্তভাবে বিভ্রান্ত ও ভ্রান্ত পদচারণার পঙ্কিলে নিমজ্জিত। বিষয়টি বিশেষভাবে ভেবে দেখার মত এবং কোনটা ঠিক তা নির্ধারণের দায়িত্ব তাঁদেরই। আমাদের কথা হল, নজরুল অবিভাজ্য এবং নজরুল প্রতিভার ফসল সমগ্র মানবজাতির এজমালি সম্পত্তি। হ্যাঁ, তাঁর একটা পারিবারিক ধর্ম অবশ্যই ছিল; ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত ধর্মাবোধও। কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যে অভিব্যক্ত ধর্মবোধ ও চেতনা গুলিয়ে ফেলার কোন কারণ নেই। তাঁর সাহিত্যচর্চার ধর্ম— উদার মানবতাবাদ, অসাম্প্রদায়িক মনন এবং জাতিধর্মবর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।

অতএব নজরুলচর্চা নামে যথেচ্ছাচার করার অধিকার কারোর নেই। সৈয়দ মুজতবা আলী নজরুল অনূদিত *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে এরকম একটা মন্তব্য করেছেন, ''তরুণদের আমি প্রায়ই বলি, রবীন্দ্র রচনাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা–এ কাব্যেই বারবার অধ্যয়ন করে অন্য টীকার প্রয়োজন নেই। ওমরই ওমরের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লীনাথ এবং কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।" আমরাও মনে করি, রবীন্দ্রকাব্যের রবীন্দ্রব্যাখ্যার মতো নজরুলচর্চার ক্ষেত্রেও নজরুলের সমগ্র সৃষ্টি ব্যঞ্জনাগত তাৎপর্যের

আলোকে নজরুল সাহিত্যের বিচার ও মূল্যায়ন হওয়াই যৌক্তিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলেও একথা সত্য যে, আমরা যে যার মত মনগড়া ব্যাখ্যায় ক্রমাগত নজরুলের সাহিত্যাদর্শকে কলুষিত করে চলেছি।

সে যাকগে। বাংলাদেশে নজরুলচর্চার বিষয়ে আরো কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করছি। নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন লেখকের ১২৫টি প্রবন্ধ নিয়ে নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ এবং ৫১টি প্রবন্ধ নিয়ে *শতবর্ষে নজরুল* শিরোনামে দুটি বৃহৎ কলেবরের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৯৯ এবং দ্বিতীয়টির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৫৫। দুটি গ্রন্থই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত বিভিন্ন লেখকের গুরুত্বপূর্ণ-অগুরুত্বপূর্ণ নজরুল বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নজরুল একাডেমি দীর্ঘদিন যাবৎ *নজরুল একাডেমী পত্রিকা* নামে একটি মানসম্মত পত্রিকা প্রকাশ করে যাচ্ছে। কিন্তু এ যাবত ঐ পত্রিকার কয়টি সংখ্যা বেরিয়েছে এবং কতজন লেখকের কত সংখ্যক লেখা তাতে স্থান পেয়েছে, তা আমার ঠিক জানা নেই। অন্যদিকে নজরুল ইনস্টিটিউট এর প্রকাশনা তালিকা ২০০৭ থেকে খাতওয়ারী নজরুল বিষয়ক প্রকাশনার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করছি:

১. নজরুল কবিতাগ্রন্থ ও অন্যান্য শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২।
২. নজরুল গীতি গ্রন্থ বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা ১১।
৩. নজরুলের কবিতা গ্রন্থের প্রতিলিপি সংস্করণের সংখ্যা ৮।
৪. নজরুল রচনার সংকলন গ্রন্থের সংখ্যা ৯।
৫. স্বরলিপি গ্রন্থ-এর সংখ্যা ৩৯।
৬. নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকার প্রকাশ সংখ্যা ৩১।
৭. নজরুল সংগীতের বাণী-এর সংখ্যা ৬।
৮. ‘বক্তৃতামালা’র সংখ্যা ১২।
৯. ‘বুলেটিন’-এর সংখ্যা ৫।
১০. ‘স্মারকগ্রন্থ’-এর সংখ্যা ২৪।
১১. বিশেষ গবেষণা (গবেষণা বৃত্তির মাধ্যমে রচিত) গ্রন্থ-এর সংখ্যা ১৩।
১২. ‘গবেষণা-গ্রন্থ’ এর সংখ্যা ১১৬।
১৩. ‘ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার প্রকাশনা’-এর সংখ্যা ৩০।
১৪. ‘অডিও ক্যাসেট’-এর সংখ্যা ৯।
১৫. ‘তথ্যচিত্র’-এর সংখ্যা ৩।
১৬. ‘পোস্টার’-এর সংখ্যা ২।
১৭. কাজী নজরুল ইসলাম বিষয়ক চিত্রকর্ম- এর সংখ্যা ১।

এতদ্ব্যতীত বাংলা একাডেমি থেকে নজরুল রচনাবলির ৪ খণ্ডের একটি নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ বঙ্গাব্দে। বর্তমানে এর আরও তিন খণ্ড বেরিয়েছে। এর আগে আবদুল কাদির সম্পাদিত কেন্দ্রীয় বাঙালা উন্নয়ন বোর্ড থেকে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে নজরুল রচনাসম্ভার ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লিখিত তথ্য থেকে নজরুল একাডেমি ও নজরুল ইনস্টিটিউটের নজরুলচর্চার একটি সাধারণ ধারণা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু তা কতটা

বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর, নির্ভুল এবং প্রামাণ্য তা বলা কঠিন। অবশ্য নজরুল একাডেমী ও কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী ও নজরুল রচনাসম্ভার— এ মন্তব্যের আওতাধীন হবে না। বিশেষত এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে এবং স্বল্পতম সময়ে লিখিত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পঠন-পাঠন অনুধাবনের সুযোগ না থাকায়, বইগুলোর গুণগত মান সম্পর্কে মন্তব্য করা সমীচীন নয়। তবে গ্রন্থ শিরোনাম দেখে অনুমান করা যায়, সেগুলোর মধ্যে কি আছে, কি থাকতে পারে।

সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর অমৃতলাল বালার সম্পাদনায় *কৃপাণ ও বাণী: কাজী নজরুল ইসলাম স্মারকগ্রন্থ* শীর্ষক একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে এপার বাংলা ওপার বাংলার শীর্ষস্থানীয় ও নবীন ৯৭ জন লেখকের বিচিত্রধর্মী লেখা নিয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'মানবতার কবি নজরুল' শীর্ষক মুহম্মদ কায়কোবাদের একটি সাক্ষাৎকার এবং ইসমাইল হোসেন সাদী রচিত কাজী নজরুল ইসলামের 'সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র ও রচনাপঞ্জী'। এতদ্ব্যতীত, আছে পরিশিষ্ট ক ও খ-এ কাজী নজরুল ইসলামের ''যদি আর বাঁশি না বাজে' এবং 'কৃষক-শ্রমিকের প্রতি সম্ভাষণ।"

আলোচনার এ পর্যায়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বাংলাদেশে নজরুলচর্চা নেহায়েত কম হচ্ছে না। বিশেষ করে ত্রিশালে 'কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এরকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু নজরুল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং নজরুল অনুরাগী বিদগ্ধ ও সচেতন পাঠক মাত্রেই জানেন যে, শুধু সংখ্যা দিয়ে এবং ভঙ্গি দিয়ে নজরুলচর্চা যে চোখ ভুলানো চেষ্টা চলছে তাকে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' যদি নাও বলি, খা আছে প্রচুর এবং বিভ্রান্ত হওয়ার মত উপাদান আছে পর্যাপ্ত। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রফেসর ড. আহমদ শরীফের *এ কালে নজরুল* (১৯৯০) গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। বলতে গেলে গ্রন্থটির আগাগোড়া নজরুল প্রতিভার 'নেগেটিভ এ্যাপ্রোচে'-ভরপুর। নজরুল সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফের একটি মন্তব্য এরকম,

> তাঁর সম্ভাবনা ছিল অসামান্য, কিন্তু সম্পূর্ণতা নেই কোথাও। সম্ভাবনা সিদ্ধান্তে পরিণতি ও পূর্ণতা পায়নি আকস্মিকভাবে তার কবি জীবনে ছেদ পড়ল বলে নয়, দীর্ঘ জীবন আমৃত্যু সৃষ্টিশীল থাকলেও সে সিদ্ধি সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে, কেন না তিনি স্রষ্টা ছিলেন বটে, কিন্তু সুরুচিনিষ্ঠ শিল্পী ছিলেন না। স্রষ্টার আবেগের সংগে শিল্পীর সংযম ও সুরুচি যুক্ত না হলে যা হয়, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে নজরুল সাহিত্য। (*এ কালে নজরুল*)

নজরুল সম্পর্কে এমন বিলাসী উন্নাসিক মন্তব্যের সূত্রপাত হয় নজরুলের এক সময়ের ভক্তকবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর একটি মন্তব্য থেকে। মন্তব্যটি হচ্ছে, "পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনও বাড়েন নি, বয়স্ক হন নি, পর পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম"। (*কালের পুতুল*) বুদ্ধদেব বসুর এ উক্তিটি যে নেহায়েতই অনসূয়াতাড়িত নিরাবেগ নজরুল গবেষক মাত্রেই তা জানেন। শুধু বুদ্ধদেব বসুর কথাই বা বলি কেন, এ কালের একশ্রেণীর অতি উৎসাহী বৃত্তায়িত বুদ্ধিজীবীও নজরুলের কবিআত্মার

কুলখানির নামে তাঁর প্রেতাত্মার চর্চা করে চলেছেন অপরিণামদর্শী হঠকারিতায়। এ সকল অপচর্চা বন্ধ হওয়া উচিত সাহিত্য সমালোচনাতত্ত্বের নিরিখে নান্দনিক বিচারে— বিষয়গত, ভাবগত ও শৈলীগত এবং কবির জাতিগত সত্তার ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর সাহিত্যিক আত্মার মর্ম অনুসন্ধানের মহোত্তর উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল চেয়ার সৃষ্টির, বাংলা একাডেমি, নজরুল একাডেমি, নজরুল ইনস্টিটিউট এর মত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের দায়সারা গোছের কিছু পত্র-পত্রিকা, কিছু বইপত্র প্রকাশ এবং সাধারণ পঠন-পাঠন যথেষ্ট নয়। বরং দরকার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিপুল চর্চা, গবেষণা এবং শুদ্ধ নজরুলসত্তার ব্যাপকতর অনুসন্ধান। নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এ দায়িত্ব পালনে অগ্রণী, সাহসী এবং পক্ষপাতশূন্য ভূমিকা রাখবে এ প্রত্যাশা জাতির সকলের। তবে নজরুলচর্চা গবেষণা, আলোচনা-সমালোচনা বা সাধারণভাবে লেখালেখি যাই বলি না কেন— 'গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার' মতো নজরুলের নিম্নোক্ত উক্তিটির সর্বতোভাবে অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়:

> 'যারা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মত হলুম না বলে'— তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরে ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।[৯]

তথ্যসূচি:

---

১. কাজী নজরুল ইসলাম, *বাঁধনহারা,* নজরুল-রচনাবলী ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ১৪০৩, পৃ. ৭৯৪-৯৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৬
৩. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, *কুহেলিকা,* পৃ. ৬৪৯
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৯
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫০
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫২
৭. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, চিঠিপত্র, পৃ. ৩৯৮-৯৯
৮. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, *দেবীস্তুতি,* পৃ. ১৯১
৯. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, *অভিভাষণ,* পৃ. ৯১